ইউনিট- ১৬

উদ্ভিদ পরিবেশ (Plant Environment)

ভূমিকা

পরিবেশের সংগে খাপ খাওয়ানো ও বেঁচে থাকার জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর গঠন, আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য দেখা যায়। পরিবেশ বিজ্ঞান (Ecology) পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য জীবকুল ও ইহার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্বন্ধে জানা। পরিবেশ বিজ্ঞান (Ecology) শব্দটির উৎপত্তি দুটি গ্রীক শব্দ হতে।

"Oikos" অর্থ ঘর বা বাসস্থান এবং logos এর অর্থ অধ্যয়ন বা জ্ঞান। সুতরাং Ecology বা পরিবেশ বিজ্ঞান এর অর্থ জীব ও ইহাদের বাসস্থান সম্পর্কে জ্ঞান আহরন। Ecology শব্দটি উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ব্যবহার শুরু হয়। Henry Thoreau ১৮৫৮ সনে প্রথম ecology শব্দটি একটি চিঠিতে ব্যবহার করেন।

পরিবেশ বলতে কি বুঝায়? সাধারণভাবে জীবকুলকে ঘিরে যে সব ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থা (মাটি, জলবায়ু, আলো, বাতাস প্রভৃতি) বিদ্যমান তাকেই পরিবেশ বলা হয়। সুতরাং বাসিন্দা, বসতি ও জলবায়ু হচ্ছে পরিবেশ বিজ্ঞানের উপাদান। তাই জীব ও ইহার বসতি এবং তাদেরকে ঘিরে যে সব পরিস্থিতি ও প্রতিবেশজাত অবস্থা বিরাজমান, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কজাত কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা করাই পরিবেশ বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য।

কখনও কখনও প্রতিকুল প্রাকৃতিক ও ভৌত কারণে দুটি ভিন্ন উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের মাঝামাঝি স্থানে উভয় সম্প্রদায়ের প্রজাতিগুলো মিশ্রিত অবস্থায় জন্মাতে দেখা যায়। এই ধরনের উদ্ভিদ সম্প্রদায়কে ইকোটন (Ecotone) বা দ্বৈত সম্প্রদায় বলে। পরিবেশের প্রকৃতির উপর উদ্ভিদের বিস্তার নির্ভর করে এবং এদের গঠনও নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন নির্দিষ্ট পরিবেশে যে সব উদ্ভিদ জন্মায় তাদেরকে ইকোটাইপ (Ecotype) বা পরিবেশ দল বলে।

পাঠ- ১ ঃ ইকোলজি ও ইহার শাখাসমূহ

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- ইকোলজির সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- ইকোলজির ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিবেশের উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ইকোলজি অধ্যয়নের ফলিত দিক সমূহ বলতে পারবেন।

সংগা

পরিবেশ বিজ্ঞান হচ্ছে জীব ও তার প্রাকৃতিক বাসস্থান সম্পর্কে জ্ঞান আহরন। অর্থাৎ বিজ্ঞানের যে শাখা পরিবেশের সাথে জীবকুলের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতিটি বিষয় পুংখানুপুংখরূপে ব্যাখ্যা করে তাকেই পরিবেশ বিজ্ঞান বলে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশ বিজ্ঞানী "Ecology" এর সংগা দিয়েছেন। নিম্নে কয়েকটি সংগা উল্লেখ করা হল ঃ

১) Ernst Haeckel (১৮৬৯) এর মত অনুযায়ী পরিবেশ বিজ্ঞান (Ecology) হলো “প্রাণী ও উহাদের জৈব এবং অজৈব পরিবেশের সহিত সার্বিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় অধ্যয়ন“।

২) Charles Elton (১৯২৭) তাঁর Animal Ecology বইতে যে সংগা দিয়েছেন তা হলো “পরিবেশ বিজ্ঞান হলো বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে অধ্যয়ন“, "Ecology is the study of scientific natural history".

৩) Eugene odum (১৯৬৩) এর মতে “পরিবেশ বিজ্ঞান হলো প্রকৃতির গঠন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে অধ্যয়ন“, "Ecology is the study of the structure and function of nature".

৪) (১৯৬১) খৃষ্টাব্দে Andrewartha ecology'র আধুনিক সংগা দিয়েছেন। তাঁর মতে পরিবেশ বিজ্ঞান হলো আন্তকার্য কলাপের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন যা প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবকুলের খাপ খাওয়ানো, বন্টন ও প্রাচুর্য্য নির্ধারন করে। "Ecology is the scientific study of the interactions that determine the adaptation, distribution and abundance of organisms in nature".

পরিবেশের উপাদান

পরিবেশ অনেক গুলো উপাদানের সমষ্টি; যে সমস্ত বস্তু বা উপাদান জীবকে (উদ্ভিদ ও প্রাণী) তার বিকাশ ও বিস্তারে প্রভাবিত করে সেগুলো হলো পরিবেশের উপাদান। এগুলো সজীব (living). বা জড় (non-living) উভয়ই হতে পারে।

পরিবেশের উপাদানগুলো জীবের বসবাসের পরিবেশ তৈরী করে এবং নানাভাবে জীবের উপর প্রভাব ফেলে।

জৈব (Biotic) উপাদান ঃ প্রাণী, উদ্ভিদ, ফাইটোপ্লাংকটন (Phytoplankton); [Phyto=উদ্ভিদ; Plankton=যা ভাসে]; অণুজীব সমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া ও বিক্রিয়ায় জড়িত কর্মকান্ড।

অজৈব (non-living) উপাদান ঃ মাটি, আলো, বাতাস, বৃষ্টিপাত ও পানি; তাপ, আর্দ্রতা ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক পরিবেশে উপরোল্লিখিত উপাদানগুলো সমষ্টিগতভাবে জীবকে প্রভাবিত করে। কারণ উপাদানগুলো একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত; (ছবি ১)।

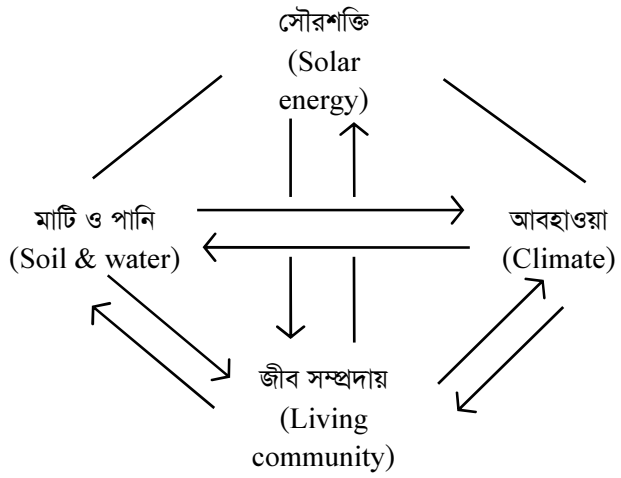

চিত্র ১৬.১ ঃ পরিবেশে biotic ও abiotic উপাদানগুলোর আন্তক্রিয়া

ইকোলজির শাখা সমূহ

i) Synecology (সিন ইকোলোজি) ঃ Syn=together অর্থাৎ একসংগে বা সম্প্রদায়; (অর্থাৎ উদ্ভিদ সম্প্রদায় বা community.)

কোন একটি উদ্ভিদ সম্প্রদায়কে (যেখানে বিভিন্ন রকম উদ্ভিদ আছে) পরিবেশের প্রভাবের সহিত সংগতি রেখে খাপ খাওয়ানো, বিতরন ও প্রাচুর্য্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরন বা অধ্যয়নকে সিনইকোলজি বলে। বাংলায় একে সম্প্রদায়গত পরিবেশবিজ্ঞান বলা যেতে পারে।

ii) Autecology (অটইকোলজি) ঃ Greek word "Auto" অর্থ self (নিজস্ব) কার্যকলাপের সহিত সংগতি রেখে যে কোন একটি জীব বা প্রজাতির প্রাকৃতিক পরিবেশে খাপ খাওয়ানো, বিতরণ ও প্রাচুর্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরন বা অধ্যয়নকে অটইকোলজি বা প্রজাতিগত পরিবেশ বিজ্ঞান বলে।

সিনইকোলজি ও অটইকোলজির বিভিন্ন শাখা আছে। উদ্ভিদ ভূগোল হতে সিনইকোলজি অধ্যয়ন শুরু হয়েছে। এই শাখার আরও অন্যান্য নাম আছে যেমন community ecology; phytosociology; Geobotany; vegetation science; ও vegetation ecology; সিনইকোলজির একটি ধাপ হলো Plant sociology. উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের (Plant community) বর্ণনা ও মানচিত্র (mapping) তৈরী করা। অতীতে এই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কি ধরনের গাছপালা ছিল, এদের বর্ণনা এবং সম্পর্কে অধ্যয়নকে Paleoecology বলে।

অটইকোলজির শাখাগুলো হলো Physiologycal ecology বা শারিরীক পরিবেশ বিজ্ঞান, অথবা ecophysiology; ও genecology.

নিম্নে ইকোলজির বিভিন্ন শাখাসমূহ দেখানো হলো ঃ

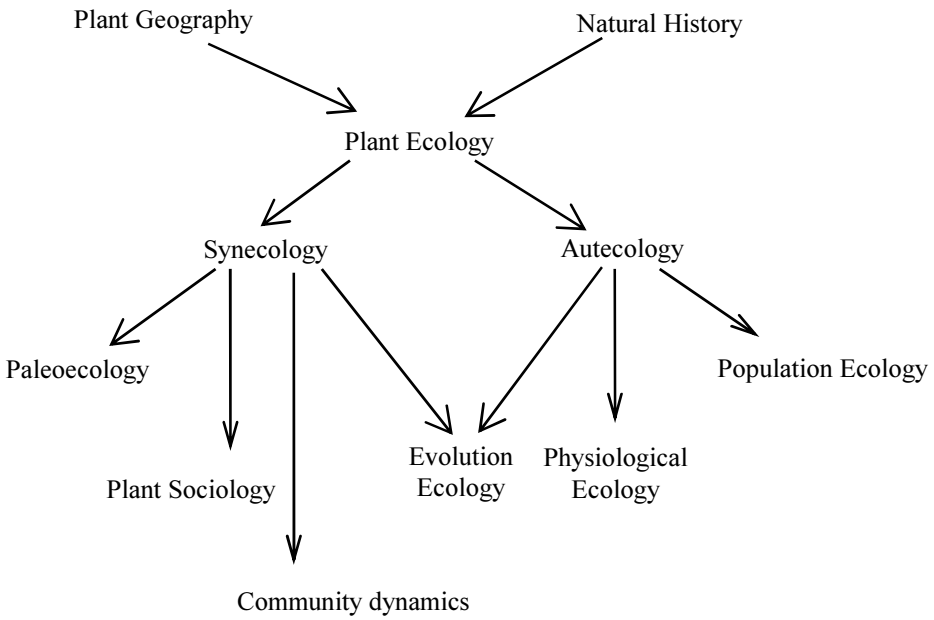

ইকোলজি অধ্যয়নের ফলিত দিক সমূহ (Applied Aspects) ঃ

i) সংরক্ষন পরিবেশ বিজ্ঞান (Conservation ecology)

ii) শস্য পরিবেশ বিজ্ঞান বা কৃষি পরিবেশ বিজ্ঞান (Crop ecology বা Agricultural ecology)

iii) দূষন পরিবেশ বিজ্ঞান (Pollution ecology)

iv) গাণিতিক পরিবেশ বিজ্ঞান (Mathematical ecology)

v) ভূমি গঠন পরিবেশ বিজ্ঞান (Landscape ecology)

সারসংক্ষেপ

পরিবেশ বিজ্ঞান পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য জীবকুল ও ইহার পারিপার্শিক পরিবেশ সম্বন্ধে জানা। Ecology শব্দটির উৎপত্তি গ্রীক শব্দ oikos মানে ঘর বা বাসস্থান; logos মানে অধ্যয়ন। Henry Thoreau ১৮৫৮ সনে একটি চিঠিতে ইকোলজি শব্দটি ব্যবহার করেন।

প্রতিকুল, প্রাকৃতিক ও ভৌত কারনে দুটি ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের মাঝামাঝি স্থানে প্রজাতিগুলো মিশ্রিত অবস্থায় জন্মালে তাকে Ecotone বলে।

পরিবেশ বিজ্ঞান হলো আন্তকার্যকলাপের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন যা প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবকুলের খাপ খাওয়ানো, বন্টন ও প্রাচুর্য্যতা নির্ধারন করে। পরিবেশের উপাদান জৈব ও অজৈব উভয়ই হতে পারে। ইকোলজির প্রধান দুটি শাখা Synecology (উদ্ভিদ সম্প্রদায়) ও Autecology (প্রজাতিগত পরিবেশ বিজ্ঞান) অর্থাৎ যদি কোন একটি বিশেষ উদ্ভিদ নিয়ে অধ্যয়ন করা হয়। Autecology কে উচ্চতর পর্যায়ে Physiological Ecology বলা হয়। ইকোলজির ফলিত শাখা সমূহ হলো ঃ Conservation ecology; Crop ecology; Pollution ecology; Mathematical ecology ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১

১। Ecology (ইকোলজি) শব্দটি প্রথমে কোন বিজ্ঞানী চিঠিতে ব্যবহার করা হয়?

ক. Ernst Haeckel
খ. Henry Thoreau
গ. Charles Eltou
ঘ. Eugene odum

২। Animal Ecology বইটি কে লিখেন
ক. Von Humboldt
খ. J.E.B. Warming
গ. Charles Elton
ঘ. Ernst Haeckel

৩। কোন পরিবেশ বিজ্ঞানীর মতে পরিবেশ বিজ্ঞান হলো প্রকৃতির গঠন ও কার্যাবলী সম্মন্ধে অধ্যয়ন?
ক. Theophrastus
খ. Eugene Odum
গ. Ludwing wildenow
ঘ. J.E. Schouw

৪। Autecology বলতে কোনটি কে বুঝায়?
ক. সম্প্রদায়গত পরিবেশ বিজ্ঞান
খ. উদ্ভিদ সমাজ বিজ্ঞান
গ. প্রজাতিগত পরিবেশ বিজ্ঞান
ঘ. ভেজিটেশন সাইনস

পাঠ– ২ ঃ উদ্ভিদ সম্প্রদায় ও উদ্ভিদ ক্রমাগমন (Plant community and Plant Succession)

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- উদ্ভিদ ক্রমাগমন কি বলতে পারবেন।
- উদ্ভিদ ক্রমাগমনের প্রকার লিখতে পারবেন।
- হাইড্রোসেরি ও জেরোসেরি বিভিন্ন পর্যায়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ক্রমাগমনের বিভিন্ন পর্যায়গুলোতে কি ধরনের উদ্ভিদ জন্মে তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- ক্রমাগমনের শেষ পর্য্যায়ে কি হয় তা বলতে পারবেন।

কোন উদ্ভিদ বিহীন এলাকায় যে পদ্ধতিতে বিভিন্ন অবস্থায় উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের পর্যায়ক্রমে আবির্ভাব ও বিলীন হওয়ার মাধ্যমে অবশেষে একটি স্থায়ী উদ্ভিদ সম্প্রদায় অরন্যভূমি পর্যায়ে উপনীত হয় তাকে উদ্ভিদ ক্রমাগমন বলে। এ পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের একই স্থানে এক উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের স্থানে অন্য উদ্ভিদ সম্প্রদায় দেখা যায়। এ ধারা চলতে চলতে এমন এক সময় আসে যখন একটি বিশেষ উদ্ভিদ সম্প্রদায় অনেকটা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্রমাগমনের গতিধারা

ক্রমাগমন সাধারনতঃ চারভাবে কাজ করে যাকে। এগুলো হলো নিম্নরূপ ঃ

১. উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে একটি ক্রমাগত পরিবর্তন।
২. প্রজাতির সংখা বৃদ্ধি এবং জীবের বিভিন্ন প্রজাতির আগমন।
৩. জৈব পদার্থের বৃদ্ধি।
৪. সম্প্রদায়ের উৎপাদন ঘাটতি।

পরিবেশে দুই প্রকারের উদ্ভিদ ক্রমাগমন পরিলক্ষিত হয়। যথাঃ

১. প্রাথমিক ক্রমাগমন (Primary Succession)
২. গৌন ক্রমাগমন (Secondary Succession)

১। প্রাথমিক ক্রমাগমন ঃ কোন একটি উদ্ভিদবিহীন এলাকায় যেখানে কোন জীব (প্রাণী ও উদ্ভিদ) ছিলনা, সেখানে যদি প্রথমে উদ্ভিদের আগমন শুরু হয়, তাকে প্রাথমিক ক্রমাগমন বলা হয়। নূতনভাবে কোন পরিবেশে যে সব উদ্ভিদ দেখা যায় তাদেরকে বলা হয় প্রাথমিক উদ্ভিদ সম্প্রদায়। উদাহরন ঃ নূতন পুকুর; নূতন বাঁধ; নূতন জাগ্রত দ্বীপ ইত্যাদি।

২। গৌন ক্রমাগমন ঃ যে স্থানে কোন এক সময় উদ্ভিদ ছিল, সেখানে এ ধরনের ক্রমাগমন দেখা যায়। পরিবেশে আবহাওয়ার কারনে বা অন্য কোন কারনে যে সমস্ত উদ্ভিদ ছিল, সেগুলি মারা যায়, তখন ঐ এলাকা উদ্ভিদশূন্য হয়ে পড়ে। এ পুরাতন পরিবেশে যখন উদ্ভিদ সম্প্রদায় পুনরায় জন্মে এবং ক্রমাগমন শুরু হয় তখন তাকে বলা হয় গৌন ক্রমাগমন।

উদ্ভিদ ক্রমাগমনের বিভিন্ন পর্যায়কে একত্রে সেরি (Sere) বলে। ক্রমাগমন যদি পানিতে শুরু হয় তখন এর বিভিন্ন পর্যায়গুলোকে একত্রে হাইড্রোসেরি (Hydrosere) বলে। ক্রমাগমন যদি শুষ্ক জায়গায় শুরু হয় তখন এর বিভিন্ন পর্যায়গুলোকে একত্রে জেরোসেরি (Xerosere) বলে।

১। হাইড্রোসেরি (Hydrosere)

হাইড্রোসেরিকে ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ

১. নিমজ্জিত পর্যায় (Submerged stage)
২. ভাসমান পর্যায় (Floating stage)
৩. নলখাগড়া পর্যায় (Read-swamp stage)
৪. তৃণ চারনভূমি পর্যায় (Sedge-Meadow stage)
৫. বনভূমি পর্যায় (Woodland stage)
৬. চূড়ান্ত অরন্যভূমি পর্যায় (Climax Forest stage)

১) নিমজ্জিত পর্যায়

কোন জলাভূমির গভীরতা ২০ ফুট বা এর কম হলে সেখানে জলজ উদ্ভিদ যথা ঃ Hydrilla, Ceratophyllum, Najus, Utricularia (ঝাঁঝি) প্রভৃতি উদ্ভিদ জন্মে। এ সমস্ত উদ্ভিদ সমূহের শিকড় মাটির সংগে আকড়াইয়া থাকেতে পারে। ফলে

পানি কর্তৃক বহনকারী পলি, বর্জ দ্রব্যাদি শিকড়ে বা গাছে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং নীচে জমা হয়। এভাবে জলাশয়ের গভীরতা কমতে থাকে। এছাড়াও জলজ উদ্ভিদের জীবনচক্র শেষ হওয়ার পর উদ্ভিদগুলো পচে জলাশয়ের নীচে জমা হয়। ফলে জলাশয় আরও অগভীর হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে *উপরিল্লেখিত নিমজ্জিত উদ্ভিদ ঐ এলাকার অযোগ্য হয়ে পড়ে। তখন* নুতন জাতের উদ্ভিদ সম্প্রদায় অর্থাৎ ভাসমান উদ্ভিদ সমূহ ঐ স্থান দখল করতে থাকে।

২) ভাসমান পর্যায়

জলাভূমির গভীরতা যখন ৩ থেকে ৮ ফুট তখন সেখানে ভাসমান উদ্ভিদ, যথা ঃ Nymphaea (শাপলা); Ottelia (পানিফল); Trapa (কাটাওয়ালা পানিফল) ইত্যাদি জন্মে। এ সমস্ত উদ্ভিদের মূল মাটিতে আকড়াইয়া থাকে এবং লম্বা বৃন্ত বিশিষ্ট প্রশস্ত পাতা পানির উপরে ভাসে এবং পানির স্তরকে ঢেকে ফেলে। এছাড়াও Lemna (ক্ষুদিপানা); Pistia (টোপাপানা); Eichhornia (কচুরীপানা) ও অন্যান্য ভাসমান উদ্ভিদ পানির উপরের স্তর দখল করে ফেলে। এতে সূর্যের আলো পানির নীচে যেতে পারেনা। প্রথমদিকে নিমজ্জিত উদ্ভিদ ও ভাসমান উদ্ভিদ একসংগে জন্মাইতে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে ভাসমান উদ্ভিদের প্রশস্ত পাতা সূর্যের আলোকে পানির ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। ফলে নিমজ্জিত উদ্ভিদ সমূহ মারা যায়। ভাসমান পর্যায়ের উদ্ভিদসমূহ যখন প্রচুর পরিমান জন্মে, তখন পানি পরিবাহিত পলিকনা, বর্জ্য দ্রব্য বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ভাসমান উদ্ভিদ মরে যাবার পর পচেঁ হিউমাস (জৈবপদার্থ) তৈরী হয় এবং জলাশয়কে আরও অগভীর করে ফেলে। পরিশেষে ঐ এলাকা ভাসমান উদ্ভিদের জন্য অযোগ্য হয়ে যায় এবং পরবর্তী পর্যায়ের উদ্ভিদ ঐ জায়গায় জন্মাতে শুরু করে।

৩। নলখাগড়া পর্যায়

পানির গভীরতা কমে যখন ১-৪ ফুট হয়ে যায় তখন নলখাগড়া জাতীয় উদ্ভিদসমূহ যেমন চযৎধমসরঃবং (নলখাগড়া); Polygonum (পানিমরিচ) ইত্যাদি জন্মাইতে শুরু করে। এ সমস্ত উদ্ভিদের গোড়া পানির নীচে এবং কান্ডের কিছু অংশ ও পাতা পানির উপরে থাকে। পূর্বের পর্যায়গুলির মত এ পর্যায়েও পানি পরিবাহিত বালি, মাটি ও উদ্ভিদের মৃত অংশ আটকাইয়া নীচে জমা হতে থাকে। এ পর্যায়ে যখন প্রচুর পরিমানে উদ্ভিদ জন্মে তখন ঐ উদ্ভিদরাজীর জন্য অনুকুল পরিবেশ থাকেনা, ফলে পরবর্তী পর্যায়ের উদ্ভিদ সমূহ জন্মাইতে শুরু করে।

৪। তৃন চারনভূমি পর্যায়

পানির গভীরতা হ্রাস পেয়ে যখন আরও শুকনার পর্যায়ে চলে আসে তখন জলজ উদ্ভিদ আর জন্মাইতে পারেনা। তখন এ পর্যায়ের উদ্ভিদ যথা Ipomoea (কলমী শাক); Enhydra (হেলেঞ্চা); Monochoria (কচুরী পানা জাতীয়) জন্মাইতে শুরু করে। এ সমস্ত উদ্ভিদের রাইজোম (শিকড়ের মত) মাটির কনা আটকাইতে সাহায্য করে এবং মৃত্তিকার গঠন অগ্রগতিতে সহায়তা করে। ফলে স্থানটি ভরাট হয়ে যায় ও অনেকটা শুকিয়ে যায় এবং উপরে উল্লিখিত উদ্ভিদ সমূহের জন্য অনুপযোগী হয়ে উঠে।

৫। বনভূমি পর্যায়

উপরের বিভিন্ন পর্যায়গুলির পর জায়গাটি এখন স্যাঁত স্যাঁতে নিম্নভূমিতে পরিনত হয়েছে। পানি লব্ধতা (Waterlogging) সহ্য করতে পারে এরকম উদ্ভিদ (যেমন Marsiliea, Colocassia) এখানে জন্মে। অধিকন্ত ছায়া সহ্যকারী Shrubs জন্মে। Shrubs জাতীয় উদ্ভিদের প্রস্বেদনের ফলে মাটির পরিবেশে পানির পরিমান আরও হ্রাস পায়। ফলে Shrubs এর ছায়ায় যে সমস্ত গাছ জন্মে সেগুলো আর থাকেনা। পরিশেষে আলো প্রিয় (Sun loving) ও ছায়া প্রিয় (Shade loving) উদ্ভিদ সমূহের মিশ্রনে উদ্ভিদ সম্প্রদায় গড়ে উঠে।

৬। চুড়ান্ত অরন্যভূমি পর্যায়

উপরের পর্যায়গুলো অতিবাহিত হবার পর মাটিতে হিউমাসের পরিমান বৃদ্ধি পায়। কারন উদ্ভিদের পাতা, কান্ড, শিকড়ের পচন ক্রিয়া চলতে থাকে। উদ্ভিদের পচনের সময় মাটিতে ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও অন্যান্য অণুজীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বিধায় মাটির বৈশিষ্ট্যের ও অনেক পরিবর্তন ঘটে। ক্রমাগমনের চুড়ান্ত পর্য্যায়ে বড় বড় উদ্ভিদ জন্মে এবং ব্যাপক বৃদ্ধি ও বিস্তার লাভ করে ঘন অরন্যের সৃষ্টি করে। মাটি ক্রমশঃ শুষ্ক হতে থাকে। তখন যে সমস্ত উদ্ভিদ শুধু শুকনা জায়গায় অর্থাৎ যেখানে মাটিতে পানির পরিমান কম। তখন এ পরিবেশ সহ্য করতে পারে এমন উদ্ভিদ প্রায় একই প্রজাতির উদ্ভিদ বেশী জন্মে এবং গভীর অরন্য সৃষ্টি করে। মোমেনশাহীর গজারী বা শালবন; চট্টগ্রামের সেগুন বন চূড়ান্ত অরন্যভূমি পর্যায়।

জেরোসেরি (Xerosere)

পাথর, কাকড়ময় এলাকা ও শুষ্ক জায়গায় অর্থাৎ যেখানে পানির অভাব, এমন জায়গায় যখন উদ্ভিদ ক্রমাগমন শুরু হয় তখন তাকে মরুজ ক্রমাগমন বলে এবং এর বিভিন্ন পর্যায়গুলোকে সমষ্টিগতভাবে জেরোসেরি বলে।

জেরোসেরির ৬টি পর্যায় আছে, যথা

১. সমাংগ লাইকেন পর্যায় (Crustose Lichen stage)
২. পত্র সাদ্রশ লাইকেন পর্যায় (Foliose lichen stage)
৩. মস পর্যায় (Moss stage)
৪. ঔষধি পর্যায় (Herbaceons stage)
৫. গুল্ম পর্যায় (Shrub stage)
৬. চুড়ান্ত অরন্য ভূমি পর্যায় (Climax Forest stage)

সারসংক্ষেপ

উদ্ভিদ ক্রমাগমনের ফলে এক উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের স্থানে অন্য উদ্ভিদ সম্প্রদায় গড়ে উঠে এবং পর্যায়ক্রমে একটি স্থায়ী উদ্ভিদ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই প্রকারের উদ্ভিদ ক্রমাগমন যথা ঃ প্রাথমিক ও গৌন ক্রমাগনন পরিলক্ষিত হয়। উদ্ভিদ ক্রমাগমনের বিভিন্ন পর্যায়কে একত্রে সেরি (Sere) বলে। ক্রমাগমন পানিতে অথবা শুষ্ক জায়গায় শুরু হতে পারে। পানিতে শুরু হলে Hydrosere এবং শুকনা জায়গায় শুরু হলে Xerosere বলা হয়। উভয় Sere তেই ছয়টি করে পর্যায় আছে। হাইড্রোসেরির পর্যায়গুলো হলো, নিমজ্জিত পর্যায়, ভাসমান পর্যায়, নলখাগড়া পর্যায়, তৃনচারন ভূমি পর্যায়, বনভূমি পর্যায় ও চূড়ান্ত অরন্যভূমি পর্যায়। প্রতিটি পর্যায়ের উদ্ভিদ প্রজাতি আলাদা। জেরোসেরির বিভিন্ন পর্যায়গুলো হলো, সমাংগ লাইকেন পর্যায়, পত্র সাদ্রশ লাইকেন পর্যায়, ঔষধি পর্যায়, গুল্ম পর্যায় ও চূরান্ত অরন্যভূমি পর্যায়। উভয় ঝবৎবতেই চূড়ান্ত অরন্যভূমি তৈরী হয়।

পঠোত্তর মূল্যায়ন- ২

১। হাইড্রোসেরিতে পর্যায় কয়টি?
ক. ৩ টি　　খ. ৪ টি
গ. ৫ টি　　ঘ. ৬ টি

২। কোন উদ্ভিদ বিহীন এলাকায় যখন প্রথম উদ্ভিদের আগমন শুরু হয় তাকে কোন ধরনের ক্রমাগমন বলা হয়?
ক. গৌন ক্রমাগমন　　খ. প্রাথমিক ক্রমাগমন
গ. হাইড্রোসেরি　　ঘ. জেরেসেরি

৩। নলখাগড়া পর্যায় হাইড্রোসেরির কোন পর্যায়?
ক. ৩য়　　খ. ৪র্থ
গ. ৫ম　　ঘ. শেষ

৪। Ottelia উদ্ভিদ হাইড্রোসেরির কোন পর্যায়ে জন্মে?
ক. নিমজ্জিত　　খ. ভাসমান
গ. নলখাগড়া　　ঘ. তৃনচারনভূমি

পাঠ- ৩ ঃ ইকোসিস্টেম (Ecosystem) ঃ শক্তি, পুষ্টি ও উপাদান সমূহ

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- ইকোসিস্টেম বলতে কি বুঝায় তা লিখতে পারবেন।
- ইকোসিস্টেমকে কতভাবে বিভক্ত করা যায় তা বলতে পারবেন।
- ইকোসিস্টেমের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ইকোসিস্টেমে শক্তি ও পুষ্টি চলাচল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্রিটিশ পরিবেশ বিজ্ঞানী এ.জি. টেন্‌স্‌লি (A.G. Tansely) ১৯৩৫ সনে সর্বপ্রথম ইকোসিস্টেম Ecosystem শব্দটি ব্যবহার করেন। Karl Mobius ১৮৭৯ সনে Biocoenosis টার্ম ব্যবহার করেন। Sukhachev ১৯৪৪ সনে Geobiocoenosis শব্দটি ব্যবহার করেন। এ সমস্ত শব্দগুলির অর্থ একই। বর্তমানে ইকোসিস্টেম শব্দটিই ব্যবহৃত হয়। Forbes একে ১৮৮৭ সনে Microcosm নামে আখ্যায়িত করেন।

সংগা

প্রকৃতির যে কোন জায়গায় যেখানে জীব ও জড় পদার্থের আন্ত:ক্রিয়া বিক্রিয়া, শক্তির প্রবাহ (flow of energy) এবং তাৎপর্যপূর্ন খাদ্যস্তর ও পুষ্টি চক্র বিদ্যমান তাকে ইকোসিস্টেম বলা হয়।

ইকোসিস্টেমকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ

১) প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেম (Natural ecosystem)

বাসস্থানের উপর ভিত্তি করে ইকোসিস্টেম নিম্ন প্রকৃতির হতে পারে ঃ

ক) স্থলভাগ (Terrestrial)

যথা ঃ বনাঞ্চল, তৃনভূমি, মরুভূমি

খ) জলজ (Aquatic)

i) মিঠা পানি (Freshwater)

a) জলাবদ্ধ পানির (Lentic) যথা ঃ পুকুর,হ্রদ

b) প্রবাহ পানি (Lotic) যথা ঃ নদী,

ii) লবণাক্ত পানি (Marine water)

iii) মোহনা (Estuarine)

২) মানুষ কর্তৃক তৈরী ইকোসিস্টেম (Man made Ecosystem)

যথা ঃ আবাদী শস্য (croplauds), বাধ (Dam)

ইকোসিস্টেমের উপাদান সমূহ ঃ (components of Ecosystem)ঃ

ক) কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে ইকোসিস্টেমের উপাদানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঃ যথা

১। অটোট্রোফিক উপাদান (autotrophic component)

২। হেটারোট্রোফিক উপাদান (heterotrophic component)

খ) গঠনগত দিক থেকে বিচার করে ইকোসিস্টেমের উপাদানকে চারভাগে ভাগ করা যায়; যথা-

১। জড়বস্তু সমূহ (abiotic substances)

২। প্লোডিউসার বা উৎপাদনকারী (producer)

৩। কনজিউমার বা গ্রহণকারী (consumer)

৪। পচনকারী ও পরিবর্তনকারী (Decomposer and transformer)

গ) বিজ্ঞানী V.E.P. odum ১৯৭১ সনে বর্ণনামূলক দিক থেকে বিবেচনা করে ইকোসিস্টেমের উপাদানকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করেছেন ঃ

১। অজৈব পদার্থ (Inorganic substances) যেমন, কার্বন, নাইট্রোজেন, কার্বনডাই অক্সাইড ও পানি।

২। জৈব যৌগিক পদার্থ (organic compounds); যেমন প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, লিপিড প্রভৃতি।

৩। জলবায়ু (climatic regime); যেমন সূর্যের আলো, তাপমাত্রা, পানি ইত্যাদি।

৪। প্রোডিউসার (producer); যেমন সবুজ উদ্ভিদ, শৈবাল, diatom (ডায়াটম) ইত্যাদি।

৫। ম্যাক্রোকনজিউমার (macro-consumer); যথা- গাছ ও অন্যান্য প্রানী।

৬। মাইক্রো-কনজিউমার (micro-consumer); যথা ঃ ব্যাকটেরিয়া (Bacteria); ছত্রাক (Fungi) প্রভৃতি।

নিম্নে ইকোসিস্টেমের গঠনগত উপাদানগুলি বর্ণনা করা হলো

১। জড়বস্তু (abiotic substances) ঃ জড়বস্তুর মধ্যে অজৈব পদার্থই প্রধান। যেমন- কার্বন, অক্সিজেন (O_2) কার্বনডাই অক্সাইড (CO_2); নাইট্রোজেন, পানি, মাটি ইত্যাদি। এগুলো উদ্ভিদ কর্তৃক সংগৃহীত হয় এবং দিনের বেলায় অর্থাৎ সূর্যের আলোতে খাদ্যে রূপান্তরিত হয়। এগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবানুর সাহায্যে মৃত উদ্ভিদ ও প্রানীর পচনের ফলে পুনরায় পরিবেশে ফিরে যায়।

২। প্রোডিউসার বা উৎপাদক (Producer) ঃ সবুজ উদ্ভিদ, ফাইটোপ্লাংকটন জড় পরিবেশ হতে শক্তি সংগ্রহ করে অন্যান্য সকল জীবের ব্যবহার উপযোগী করে তুলে। উৎপাদক সূর্যের আলোক শক্তিকে (Light energy) জৈবিক যৌগিক পদার্থ হিসাবে আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যথা পুকুরের ইকোসিস্টেমে শৈবাল (algae); শাপলা, পানিফল ও বিভিন্ন প্রকার জলজ উদ্ভিদ উৎপাদক হিসাবে কাজ করে।

৩। কনিজিউমার বা গ্রহণকারী (Consumer) ঃ যে সমস্ত জীব বা প্রাণী ভৌতিক পরিবেশ হতে শক্তি সংগ্রহ করতে পারেনা এবং উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল তাদেরকে কনজিউমার বলে। যে সমস্ত প্রাণী উদ্ভিদ খেয়ে বেচে থাকে তাদেরকে প্রাথমিক কনজিউমার (Primary cousumer) বলে; এবং মাংসভোজী প্রাণীকে গৌন কনজিউমার (Secondary consumer) বলে। প্রাথমিক কনজিউমার হলো তৃণভোজী প্রাণী; ছোট ছোট মাছ; গৌন কনজিওমার হলো মাংস ভোজী প্রাণী; বড় বড় মাছ ইত্যাদি।

৪। পচনকারী (Decomposer) ঃ ব্যাকটেরিয়া ও মোল্ড পচনকারী হিসাবে কাজ করে। ইহারা মৃতজীবদেহকে ধীরে ধীরে ভেংগে সরলতর পদার্থে রূপান্তরিত করে। এগুলোর প্রভাবেই প্রাণীর জৈব পদার্থসমূহ অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত হয়, যা উদ্ভিদ গ্রহন করে। ব্যাকটেরিয়া ও মোল্ড ছত্রাককে মাইক্রোকনজিউমারও বলা হয়।

এছাড়াও কিছু ব্যাকটেরিয়া পচনের ফলে উৎপন্ন বস্তুর উপর ক্রিয়া করে জৈব ও অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত করে; তাদেরকে ট্রান্সফরমার (Transformer) বলে।

ইকেসিস্টেমের প্রকৃতি (The Nature of Ecosystem)

যে কোন ইকোসিস্টেমের মধ্যে শক্তি চলাচল হলো

Autotroph → heterotroph;

Producer → consumer

Producer → herbivore, carnivore সম্পর্কের মাধ্যমে। শক্তি একই দিকে চলাচল করে অর্থাৎ unidirectional এবং অচক্রাকার। যে সমস্ত জীব পচন কার্যে সহায়তা করে তাদের দেহে এনজাইম (Enzyme) উৎপন্ন হয় এবং মৃতদেহে নির্গত হয়। পচনকারী জীব জৈব পদার্থ মিনারালাইজেশনে (mineralization) সহায়তা করে। প্রোটোপ্লাজমের মৌলিক পদার্থসমূহ (Basic elements) পরিবেশে বের হয়ে আসে এবং পুনরায় ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত জীব reduce করতে পারে (অর্থাৎ reducers) তাদের কাছে প্রাপ্য হয়। সুতরাং শক্তি ও পুষ্টি চলাচল একই সংগে যুক্ত। পুষ্টি চলাচল চক্রাকার এবং বিভিন্ন গতিমুখী (multidirectional).

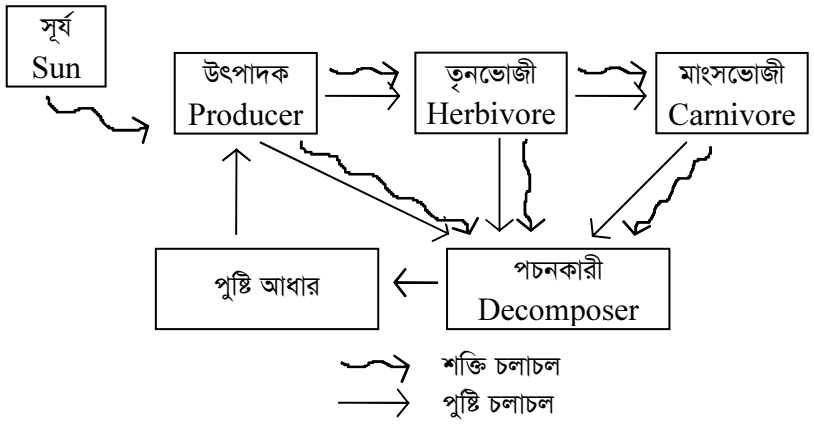

চিত্র- ১৬.২ ঃ ইকোসিস্টেমে শক্তি ও পুষ্টি চলাচলের সহজ মডেল। শক্তি চলাচল অচক্রাকার (চিহ্ন ⤳) এবং পুষ্টি চলাচল চক্রাকার (চিহ্ন ⟶)।

সারসংক্ষেপ

ইকোসিস্টেম শব্দটি A. G. Tansely ১৯৩৫ সালে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। Biocoenosis ও Geobiocoenosis এবং Microcosm এর অর্থ ও ইকোসিস্টেম। ইকোসিস্টেমকে দুটি ভাগে যথা প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেম এবং মানুষ কর্তৃক তৈরী ইকোসিস্টেমে ভাগ করা হয়। ইকোসিস্টেমের উপাদানকে কার্য্যকলাপের উপর ভিত্তি করে দু ভাগে এবং গঠনগত দিক থেকে ৪ ভাগে ও বর্ণনামূলক দিক থেকে ৬ ভাগে বিভক্ত করা যায়।

জড়বস্তুর অজৈব পদার্থ হলো কার্বন, অক্সিজেন, কার্বনডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন, পানি, মাটি প্রভৃতি। উৎপাদক (Producer) হলো সবুজ উদ্ভিদ ও ফাইটোপ্লাংকটন। এগুলো সূর্যের আলোক শক্তিকে জৈবিক যৌগ পদার্থে রূপান্তরিত করে। পুকুরের ইকোসিস্টেমে শৈবাল, শাপলা, পানিফল ইত্যাদি হলো উৎপাদক। যে সমস্ত প্রাণী উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল এবং শুধু উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে তাদেরকে বলা হয় প্রাথমিক কনজিউমার; এবং মাংসভোজী প্রাণীকে বলা হয় গৌন কনজিউমার ব্যাকটেরিয়া ও মোল্ড ছত্রাককে পচনকারী বলে। যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া পচনের ফলে উৎপন্ন বস্তুর উপর ক্রিয়া করে জৈব ও অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত করে এদেরকে ট্রানসফর্মার বলে।
ইকোসিস্টেমে শক্তি চলাচল অচক্রাকার এবং পুষ্টি চলাচল চক্রাকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩

১। Biocoenosis শব্দটি ব্যবহার করেন?
ক. A. G. Tansely
খ. Karl Mobios
গ. Sukhacher
ঘ. Forbes

২। নদীর ইকোসিস্টেমকে কি বলা হয়?
ক. জলাবদ্ধ পানি (Lentic)
খ. প্রবাহমান পানি (Lotic)
গ. মোহনা (Estuary)
ঘ. টেরিষ্ট্রিয়াল

৩। কোন বিজ্ঞানী বর্ণনামূলক দিক থেকে ইকোসিস্টেমকে ভাগ করেন।
ক. Forbes
খ. A. G. Tansely
গ. E. P. Odum
ঘ. Karl Mobios

৪। কোনটি ইকোসিস্টেমে চক্রাকার?
ক. পুষ্টি
খ. শক্তি
গ. প্রাথমিক কনজিউমার
ঘ. গৌন কনজিউমার

পাঠ ৪ ঃ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ঃ সুন্দরবন (Mangrove forest Sundarban)

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বলাঞ্চলের আয়তন, অবস্থান ও পরিবেশ লিখতে পারবেন।
- সুন্দরবনের প্রধান প্রধান উদ্ভিদগুলির নাম বলতে পারবেন।
- লবনাক্ততার উপর নির্ভর করে এ বনকে কতগুলি জোনে বিভক্ত করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সুন্দরবনের উদ্ভিদের অংকুরোদগম কিভাবে হয় তা বলতে পারবেন।
- সুন্দরবনের প্রানীজগৎ (বন্যপ্রানী, পাখী ও নদীর মাছ) সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

"ম্যানগ্রোভ" শব্দটি সাধারনত: দুটি দৃষ্টিকোন হতে ব্যবহৃত হয়, যথা ঃ
১) জোয়ার ভাটা অঞ্চলে কাষ্ঠ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ সম্প্রদায়কে বর্ণনা করার জন্য।
২) কোন্ কোন্ জাতীয় ও কি কি উদ্ভিদ সমূহ এ ধরনের পরিবেশে জন্মে তা জানার জন্য।

বাংলাদেশে খুলনা জেলার দক্ষিনে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ (mangrove) বনাঞ্চল গুলির মধ্যে একটি সুন্দরবন ম্যানগ্রভ বন। উত্তর দক্ষিনে প্রায় ৬০ মাইল লম্বা এবং পূর্ব পশ্চিমে প্রায় ৪০-৪২ মাইল প্রশস্ত। এ বনের ভৌগোলিক অবস্থান ২১°৩ থেকে ২২°৩০′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯° থেকে ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। বনভূমি এলাকার মোট জমি ১৪,২৫,৮৯৫ একর; তন্মধ্যে ১০,০৬০০০ একর স্থলভূমি; বাকী অংশ নদী, খাল ও নালার জলভূমি। খুলনা জেলার দক্ষিনাংশে যেখানে জনবসতি শেষ হবার পথে সেখান থেকেই এ বনভূমি শুরু। বন শুরু হবার পর আর কোন বাড়ীঘর বা জনবসতি দেখা যায়না। পূর্বে সুন্দরবনের বিস্তৃতি অনেক বড় ছিল। কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য বনভূমি কেটে ফেলায় বর্তমানে আয়তন বেশ কমে গেছে।

বনের মাঝে অসংখ্য বড় ও ছোট নদী আছে। তন্মধ্যে বালেশ্বর, পশুর, ভোলা, শেলা, শিবসা, আরপাংগাসিয়া, মালঞ্চ, রাইমংগল, ফিরিংগি অন্যতম।

প্রশাসনের সুবিধার জন্য সুন্দরবনকে চারটি রেঞ্জে (Range) ভাগ করা হয়েছে। মংলা বন্দরের নিকটবর্তী চাঁদপাই রেঞ্জ; তারপরই ভোলা নদী সংলগ্ন শরনখোলা রেঞ্জ; খুলনা রেঞ্জ পশুর নদী সংলগ্ন এবং সর্ব পশ্চিমে আরপাংগাশিয়া নদীর তীরে সাতক্ষীরা রেঞ্জ বা বুড়ি গোয়ালিনি রেঞ্জ। পশুর নদী দিয়ে সমুদ্রগামী জাহাজ মংলা বন্দরে আসে। পশুর নদী সমূদ্রে মেশার পূর্বে শিবসা নদী এসে পশুর নদীর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। আয়তনের দিক থেকে সাতক্ষীরা রেঞ্জ সবচেয়ে বড়। সুন্দরবনের নদীগুলো ছোট ছোট খালের মাধ্যমে একে অপরের সাথে সংযুক্ত। প্রতিদিন বার ঘন্টা পর পর দুবার জোয়ার ও দুবার ভাটা হয়। দক্ষিনে সমুদ্র বিধায় এ অংশে জোয়ারের উচ্চতা কিছুটা বেশী। পূর্ণ জোয়ারের সময় বন প্লাবিত হয়ে যায়।

বনের পূর্বদিকের বিশেষ করে শরনখোলা ও চাঁদপাই সংলগ্ন নদীগুলোতে স্রোত বেশী। ফলে প্রচুর স্বাদু পানি সমূদ্রে গিয়ে পতিত হয়। জোয়ারের সময় সমূদ্রের যে লবনাক্ত পানি প্রবেশ করে, ভাটার সময় তা পুনরায় সমূদ্রে চলে যায়। ফলে এ অঞ্চলগুলোর নদীগুলোতে লবনাক্ততার (Salinity) পরিমান কম। বালেশ্বর নদী উজানে মধুমতী ও গড়াই নামে পরিচিত। গড়াই পদ্মা নদীর একটি বড় শাখা। গড়াই নদী দিয়ে প্রচুর পরিমানে পদ্মানদীর স্বাদু পানি এসে বালেশ্বর নদী হয়ে সমূদ্রে পতিত হয়। এজন্যে বালেশ্বর নদী ও বনের পূর্বাঞ্চলের নদীগুলোতে লবনাক্ততা কম। বর্তমানে শীত মওশুমের শেষে ফারাক্কা বাধের জন্য পদ্মা নদীতে পানির প্রবাহ খুবই কম থাকে বলে বালেশ্বর নদী দিয়ে স্বাদু পানির প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে এবং বনের পূর্বাঞ্চলে লবনাক্ততার পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের ও পরিবর্তন ঘটেছে। পশ্চিম দিকের নদীগুলোতে স্রোত কম এবং লবনাক্ততাও বেশী।

লবনাক্ততার উপর ভিত্তি করে সুন্দরবনকে পরিবেশগত দিক থেকে (Walter এর শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী) তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে।

১। অলিগোহেলাইন জোন (Oligohaline zone) ঃ শরনখোলা রেঞ্জ ও চাদপাই রেঞ্জের পূর্বদিকের অংশ।
২। মেজোহেলাইন জোন (Mesohaline zone) ঃ চাদপাই রেঞ্জের পশ্চিমাংশ ও খুলনা রেঞ্জের পূর্বাংশ।
৩। পলিহেলাইন জোন (Polyhaline zone) ঃ সাতক্ষীরা রেঞ্জে ও খুলনা রেঞ্জের পশ্চিমাংশ।
৪। ইউহেলাইন জোন (Euhaline Zone) ঃ দক্ষিনে সমুদ্রের অংশ; যেখানে কোন গাছপালা নেই; শীত মতসুমে যখন পানি কমে যায় তখন মাস বা গুল্ম জাতীয় দু একটা উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায়।

সুন্দরবনে সর্বত্র কাদামাটি দেখা যায়। সুন্দরবনের নদীতে কুমীর ও কামোট আছে। ডাঙায় বাঘ থাকে। বাঘ ও কুমীরের কবলে অনেক লোক প্রাণ হারিয়েছে। জেলেরা নদীর ধারে বা খোলা অঞ্চলে অস্থায়ীভাবে বসবাস করে। জেলেদের

সবচেয়ে বড় অস্থায়ী বাসভূমি গড়ে উঠে দুবলা দ্বীপে। এ দ্বীপটি সমুদ্রের কিনারায় অবস্থিত। নভেম্বর মাস হতে মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত এখানে জেলেরা বসবাস করে এবং বিভিন্ন রকমের মাছ যেমন ছুরি, রূপচাঁদা, লইট্টা ধরে শুটকি করে।

সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের মধ্যে সুন্দরী গাছ প্রধান; অনেকের ধারনা এ গাছের নাম থেকেই বনের নাম সুন্দরবন হয়েছে। অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যে গেওয়া, বাইন, গরান, কেউড়া, ধুন্দল, লসী, কাকড়া, পশুর, গোলপাতা, হেতাল উল্লেখযোগ্য।

সুন্দরীগাছ বনের পূর্বাঞ্চলেই বেশী (Oligohaline Zone)। অত্যধিক লবনাক্ত এলাকায় সুন্দরী গাছ জন্মাতে পারেনা। এ গাছ লম্বায় প্রায় ১০০ ফুটের অধিক হয়ে থাকে। সুন্দরবনের উদ্ভিদের বীজ গাছ হতে পতিত হবার পূর্বেই অংকুরিত হয়। এ ধরনের অংকুরোদগমকে জরায়ুজ অংকুরোদগম বা Viviparous germination বলে।

গেওয়া গাছ হতে নিউজপ্রিন্ট কাগজ তৈরী হয়। গেওয়া উদ্ভিদ বনের মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলেও পাওয়া যায়।

গোলপাতা বনের সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। এ গাছ দেখতে অনেকটা নারিকেল গাছের মত। গোলপাতা গাছের পাতা দিয়ে বাংলাদেশের দক্ষিনাঞ্চলে ঘর, নৌকার ছাউনি, ঘরের বেড়া দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।

জোয়ারের সময় বন সর্বত্র প্লাবিত হয়ে যায়; ফলে মূলের শ্বসনক্রিয়ার জন্য শিকড় থেকে নিউমেটোফোর (Pneumatophore) বা শ্বাসমূল বের হয়। শ্বাসমূল ৪″-১২″ পর্যন্ত লম্বা হয়।

হরিণ, বণ্যশূকর, বানর, বণমোরগ, ভিমরাজ, পেচা সুন্দরবনের আকর্ষনীয় বণ্য পশুপাখী। নদীগুলোতে ইলিশ, চিংড়ি, ছুরি, তাপসী, লটিয়া, ভেটকি প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়।

এপ্রিল মে ও জুন মাসে সুন্দরবন হতে প্রচুর মধু সংগ্রহ করা হয়। সুন্দর বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বজায় রাখার জন্য UNESCO ১৯৯৯ সনে এ বনকে World Heritage হিসাবে ঘোষনা দিয়েছে। সুন্দরবনের বিভিন্ন ইকোলজিক্যাল জোন এ প্রধান প্রধান কিছু উদ্ভিদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১। Oligohaline Zone
- i) সুন্দরী (*Heritiera fomes*)
- ii) গেওয়া (*Excoecaria agallocha*)
- iii) বাইন (*Avicennia alba*)
- iv) সিংগারা (*Cynometra ramiflora*)

২। Mesohaline zone
- i) গেওয়া (*Excoecaria agallocha*)
- ii) কেউরা (*Sonneratia apetala*)
- iii) গর্জন (*Rhizophora mucronata*)
- iv) পশুর (*Xylocarpus granatum*)

৩। Polyhaline zone
- i) গরান (*Ceriops decandra*)
- ii) খলসী (*Aegiceras corniculatum*)
- iii) কাকড়া (*Bruguiera sexangula*)
- iv) হেতাল (*Phoenix paludosa*)

এ ছাড়া গোলপাতা (*Nypa fruticans*) বনের সর্বত্রই পাওয়া যায়।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে খুলনা জেলার দক্ষিনে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বনগুলির মধ্যে ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন একটি। এর আয়তন প্রায় ১৪২৫৮৯৫ একর। তন্মধ্যে ১০০৬০০০ একর স্থলভূমি। বনের মাঝে অসংখ্য ছোট ও বড় নদী আছে। তন্মধ্যে বালেশ্বর, পশুর, শেলা, মালঞ্চ, আর পাংগাসিয়া রাইমংগল বেশ বড়। প্রশাসনের সুবিধার জন্য সুন্দরবনকে চারটি রেঞ্জে ভাগ করা হয়েছে। জোয়ারভাটার ফলে এ বন দুবার প্লাবিত হয়। লবনাক্ততার উপর ভিত্তি করে সুন্দরবনকে তিনটি ইকোলজিক্যাল জোনে (Oligohaline zone, Mesohaline zone, এবং Polyhaline zone) ভাগ করা হয়েছে। সুন্দরবনের প্রধান প্রধান উদ্ভিদগুলো হল ঃ সুন্দরী, গেওয়া; বাইন; গরান; খলসী; কেউরা; গোলপাতা প্রভৃতি। সুন্দরী গাছ কম লবনাক্ত অঞ্চলে (Oligohaline zone) ভাল হয়। বেশী লবনাক্ত অঞ্চলে (polyhaline zone) গরান ও খলসী ভাল জন্মে। গোলপাতা বনের সর্বত্রই পাওয়া যায়। এ গাছের পাতা ঘর, নৌকার ছাউনি, ঘরের বেড়া দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। সুন্দর বনের গাছের জরায়ুজ অংকুরোদগম পরিলক্ষিত হয়। গাছের শ্বসন ক্রিয়ার জন্য মূল হতে নিউমেটোফোর (Pneumatophore) বা শ্বাসমূল বের হয়। ১৯৯৯ সনে এ বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য রক্ষা করার জন্য UNESCO সুন্দরবনকে World Heritage হিসাবে ঘোষনা দিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪

১। সুন্দরবনের আয়তন কত একর?

ক. ১৪,২৫,৮৯৫ খ. ১২,২৫,৮৯৫

গ. ১৩,২৫,৯৮৫ ঘ. ১৫,২৫,৮৯৫

২। কোন্ ড়হব এ সুন্দরী গাছ বেশী পাওয়া যায়?

ক. Polyhaline zone খ. Euhaline zone

গ. Oligohaline zone ঘ. Mesohaline zone

৩। গোলপাতা গাছ কোথায় পাওয়া যায়?

ক. বনের সর্বত্র খ. বনের পশ্চিমাঞ্চলে

গ. বনের পূর্বাঞ্চলে ঘ. খুলনা রেঞ্জে

৪। কোথায় জেলেদের সবচেয়ে বড় অস্থায়ী বাসভূমি গড়ে উঠেছে?

ক. পশুর নদীর তীরে খ. চাঁদপাই রেঞ্জে

গ. দুবলা দ্বীপ ঘ. কটকা দ্বীপে

পাঠ- ৫ ঃ ইকোলজিক্যাল পিরামিড (Ecological pyramid)

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- ফুড চেইন কি তা বলতে পারবেন।
- সংখ্যার পিরামিড ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জৈবিক ও জনের পিরামিড সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- শক্তির পিরামিড সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ফুড চেইন (food chain) বা খাদ্য শৃংখল ঃ যে কোন ইকোসিস্টেমে বিভিন্ন প্রকার জীব (প্রাণী ও উদ্ভিদ) খাদ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী একটি ছকে বিন্যস্ত অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার জীবের মাধ্যমে [যেমন তৃনভোজী (herbivores); মাংসভোজী (Carnivores) ও পচনকারী] শক্তির বদল (Energy transfer) সরাসরি রেখায় (Linear line) সজ্জিত; পুনঃ পুনঃ খাচ্ছে এবং তাকেও ভক্ষন করছে; একেই বলা হয় ফুড চেইন বা খাদ্য শৃংখল।

প্রকৃতিতে দু প্রকার খাদ্য শৃংখল দেখা যায় ঃ যথা-

১। চড়ানো (Grazing) খাদ্য শৃংখল

উদাহরণ

ফাইটোপ্লাংকটন → জুপ্লাংকটন → মাছ

অথবা

ঘাস → ইদুর → শিয়াল

উপরের উদাহরণ হতে বুঝা যায় ইদুর ঘাস খায়, আবার শিয়াল ইদুরকে খায়।

২) Detritus (মৃতজৈব পদার্থ) খাদ্য শৃংখল

ফুড চেইনের বিভিন্ন খাদ্য স্তরকে ট্রোফিক লেভেল (Troptric level) বলে।

ফুড ওয়েব (Food web) বা খাদ্য জাল

যে কোন সম্প্রদায়ে সমস্ত খাদ্য শৃংখল পেঁচানো (complicated) নেটওয়ার্ক গঠন করে এবং খাদ্যজাল তৈরী করে। খাদ্যজাল হলো যে কোন জীব সম্প্রদায়ের ভেতর খাবার পদ্ধতির সম্পর্ক। খাদ্য শৃংখলগুলির মধ্যে সম্পর্ককে খাদ্য জাল বলা হয়।

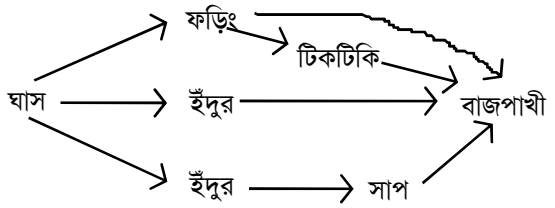

চিত্র ১৬.৩ ঃ ফুড ওয়েব

Ecological pyramid (ইকোলজিক্যাল পিরামিড)

কোন ফুড চেইনের বিভিন্ন খাদ্য স্তরে (Trophic level) অবস্থানরত জীবের সংখ্যা, শক্তি ও ওজন পর্যায়ক্রমে কমে যায়। খাদ্যস্তরগুলির মধ্যকার এ রকম সম্পর্কের ছবি বা চিত্র একটা পিরামিডের আকার ধারন করে। একেই ইকোলজিক্যাল পিরামিড বলে। ইকোলজিক্যাল পিরামিড তিন প্রকার; যথা ঃ

১. সংখ্যার পিরামিড (Pyramid of numbers)
২. জৈবিক ওজনের পিরামিড (Pyramid of biomass)
৩. শক্তির পিরামিড (Pyramid of energy)

১। সংখ্যার পিরামিড (Pyramid of numbers)

এতে প্রত্যেক ফুড চেইনের প্রথম খাদ্যস্তরের জীবের সংখ্যা শেষ খাদ্য স্তরের জীবের সংখ্যার তুলনায় বেশী। ফুড চেইনের খাদ্যস্তরের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সম্পর্ক দেখানোর জন্য সৃষ্ট পিরামিড আকৃতির লৈখিক অংকনকে সংখ্যার পিরামিড বলে।

চিত্র ১৬.৪ (ক) ঃ সোজা পিরামিড চিত্র ১৬.৪ (খ) ঃ উল্টা পিরামিড

চিত্র ১৬. ৪ (ক,খ) ঃ সংখ্যার পিরামিড

এতে দেখা যায় ফুড চেইনের শুরুতে খাদ্য স্তরে উদ্ভিদ অবস্থিত এবং এদের সংখ্যা অনেক বেশী। (দ্বিতীয় খাদ্য স্তরে প্রাণীর সংখ্যা (ফড়িং) প্রথম স্তরের উদ্ভিদের সংখ্যা হতে কম। তেমনি তৃতীয় স্তরের জীবের (ব্যাঙ) সংখ্যা ২য় স্তরের সংখ্যা হতে কম। অর্থাৎ প্রতি স্তরে জীবের সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে এবং একটি ত্রিকোনাকৃতির পিরামিডের আকার ধারন করছে। সংখ্যার পিরামিড উল্টাও হতে পারে চিত্র ১৬.৪ (খ)। খাদ্য শৃংখলের প্রথম স্তরের একটি বৃহৎ উদ্ভিদ; বৃক্ষের ফল ও পাতার উপর নির্ভরশীল ২য় খাদ্য স্তর (পাখীর সংখ্যা); এবং ৩য় স্তরে অবস্থিত পাখীদের শরীরে বসবাসরত অসংখ্য পোকা। সুতরাং দেখা যায় সংখ্যার পিরামিড উল্টা আকৃতির হতে পারে।

২। জৈবিক ওজনের পিরামিড (Pyramid of biomass) ঃ কোন পরিবেশে কোন নির্দিষ্ট সময়ে জীবের শুকনা ওজনকে (dry weight) জৈবিক ওজন (biomass) বলে। কোন একটি ফুড চেইনের খাদ্যস্তরগুলির জৈবিক ওজন নেয়া হয় এবং এদের ফলাফল দ্বারা লৈখিক চিত্র অংকন করলে এটাকে পিরামিডের মত দেখায়। একেই জৈবিক ওজনের পিরামিড বলে। চিত্রে দেখা যায় (১৬.৫) একটি উদ্ভিদের জৈবিক ওজন উহার উপর নির্ভরশীল পাখীদের ওজন হতে অনেক বেশী; পাখীদের ওজন উহাদের উপর নির্ভরশীল পরজীবি পোকামাকড়ের ওজনের চেয়ে বেশী। যদিও পোকামাকড়ের সংখ্যা অনেক। জৈবিক ওজনের পিরামিড উল্টাও হতে পারে। যেমন সমুদ্র বা নদীতে ফুড চেইনের চিত্র থেকে বুঝা যায়। ফাইটোপ্লাংকটনের ওজন তাদের উপর নির্ভরশীল ছোট মাছগুলি থেকে কম; এবং ছোট মাছগুলির ওজন তাদের উপর নির্ভরশীল বড় মাছের ওজনের ঢাইতে কম।

চিত্র ১৬.৫ (ক) ঃ সোজা পিরামিড চিত্র ১৬.৫ (খ) ঃ উল্টা পিরামিড

চিত্র ১৬.৫ (ক,খ) ঃ জৈবিক ওজনের পিরামিড

৩। শক্তির পিরামিড (Pyramid of Energy) ঃ যে কোন ইকোসিস্টেমে একটা ফুড চেইনের বিভিন্ন খাদ্য স্তরে বিশেষ সময়ে শক্তি নির্ণয় করে লৈখিক চিত্র অংকন করা যায় এবং এটা পিরামিডের আকার ধারন করে। এটাকে শক্তির পিরামিড বলা হয়। একটি বিশেষ এলাকার উদ্ভিদ নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমান শক্তি সংগ্রহ করতে পারে তা একই সময়ে অন্যান্য খাদ্য স্তরের ঐ এলাকার জীবসমূহ যে পরিমান শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে তা থেকে অনেক বেশী। একটি পুকুরের শক্তির পিরামিড দেখান হলো। পুকুরে ফাইটোপ্লাংকটনের সংখ্যা অত্যধিক এবং এদের জীবনচক্র অতি অল্প সময়ে শেষ হয় বলে দ্রুত বংশ বিস্তার করতে পারে। ফাইটোপ্লাংকটন যে পরিমান শক্তি সঞ্চয় করতে পারে তা অল্প সংখ্যক মাছের শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষমতা থেকে অনেক বেশী। (চিত্র- ১৬.৬)। আবার ২য় খাদ্য স্তরের মাছের শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষমতা শেষ খাদ্য স্তরের মংস ভোজী প্রাণী থেকে বেশী।

চিত্র ১৬.৬ ঃ একটি শক্তির পিরামিড ঃ ১- প্রোডিউসার; ২- প্রাথমিক কনজিউমার;
৩- দ্বিতীয় স্তরের কনজিউমার; ৪- তৃতীয় স্তরের কনজিউমার

সারসংক্ষেপ

ইকোলজিক্যাল পিরামিড, ফুড চেইন, ফুড ওয়েবের সহিত সংযুক্ত। ফুড চেইনে একটি ছক থাকে এবং প্রকৃতিতে চড়ানো (Grazing) ও Detritus ফুড চেইন বিদ্যমান। ফুড ওয়েব একটি খাদ্য শৃংখলের পেচানো (complicated) নেটওয়ার্ক। ফুড চেইনের বিভিন্ন খাদ্য স্তরে (Trophic level) অবস্থানরত জীবের সংখ্যা, শক্তি ও ওজন পর্যায়ক্রমে হ্রাস পায়। খাদ্যস্তরগুলির মধ্যে সম্পর্ক চিত্রে একটি পিরামিডের আকার ধারন করে। ইকোলজিক্যাল পিরামিড তিনপ্রকার, যথা, (১) সংখ্যার পিরামিড; (২) জৈবিক ওজনের পিরামিড ও (৩) শক্তির পিরামিড।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫

১। ফুড কিভাবে চেইন সজ্জিত?
ক. বাকা রেখায় খ. সরাসরি রেখায়
গ. এলোমেলো ঘ. নেট ওয়ার্কে

২। Detritus হলো
ক. ফুডওয়েব খ. ফুড চেইন
গ. জৈবিক পিরামিড ঘ. শক্তির পিরামিড

৩। সংখ্যার পিরামিড হতে পারে
ক. ত্রিকোনাকৃতির সোজা খ. ত্রিকোনাকৃতির সোজা ও উল্টা
গ. শুধু উল্টা ঘ. ত্রিকোনাকৃতির উল্টা

পাঠ- ৬ ঃ বায়োজিও কেমিকেল চক্র বা জীব ভূ-রাসায়নিক চক্র (Bio geochemical cycle)

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- জীব ভূ-রাসায়নিক চক্রের সংগা বলতে পারবেন।
- জীব ভূ-রাসায়নিক চক্র কত প্রকার তা লিখতে পারবেন।
- বায়বীয় চক্র ও পাললিক চক্রের আধার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

Bio বলতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনকে বুঝায়; Geo বলতে ভূমি বা পৃথিবীকে বুঝায়। এখানে জীবের ভূমির সাথে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে সম্পর্ক তাকে বুঝায়। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের মাটির সাথে ও সমুদ্রের সাথে আদান প্রদান ঘটে, তাকে ভূ-রাসায়নিক চক্র বলে। রাসায়নিক পদার্থসমূহ মাটি অথবা পানির ধারার সাথে মিশে এবং পরবর্তী কোন এক সময়ে পুনরায় মাটিতে ফিরে আসে। এভাবে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের মাটি ও পানির প্রবাহের মধ্যে আদান প্রদান হয়।

পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ হতে রাসায়নিক পদার্থের যে আদান প্রদান হয় তাকে বলা হয় Bio geochemical চক্র। জীবদেহের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ এবং অজৈব পদার্থসমূহ যেভাবে চলে থাকে তাকে বলা হয় পুষ্টি চক্র (Nutrient cycle)। Biogeochemical চক্রকে দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা ঃ

১। বায়বীয় প্রকৃতির (Gaseous type)
২। পাললিক প্রকৃতির (Sedimentary type)

বায়বীয় প্রকৃতির চক্রে আধার আকাশে এবং সমুদ্রে অবস্থিত। পাললিক প্রকৃতির চক্রে আধার পৃথিবী পৃষ্ঠের ভেতরে অর্থাৎ মাটির ভেতরে অবস্থিত। ইকোলজি শুধু জীব ও পরিবেশের সম্পর্কই নয় বরং এর সাথে যে সব জড় পদার্থ আছে তার সাথেও ভাল সম্পর্ক আছে। পৃথিবীতে যত রকমের উপাদান আছে সেগুলোর ৩০ থেকে ৪০ রকমের উপাদান জীবদেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এসব উপাদানের মধ্যে কার্বন, হাই ড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন জীবের জন্য অতি প্রয়োজনীয় এবং জীব এগুলোর প্রত্যেকটি বেশ ব্যবহার করে থাকে। এগুলো ব্যতিরেকে আরও অনেক উপাদান আছে সেগুলো অতি অল্প পরিমানে জীবের কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উপাদান পরিমানে বেশী অথবা অল্প পরিমানেই হোক তা একটি চক্রের মাধ্যমে জীবদেহে আসে এবং পুনরায় জীবদেহ হতে বের হয়ে পরিবেশে মিশে যায়।

পরিবেশে লক্ষ্য করা যায় যে, শক্তির ধারা একদিক হতে অন্যদিকে পদার্থের চক্রকে সরিয়ে নিয়ে যায়। বিভিন্ন পদার্থ কখনই একভাবে অবস্থান করে না। কোন পরিবেশ রীতিতেই এমন দেখা যায় না যে সব পদার্থ সেখানে সমানভাবে অবস্থান করে। চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি বুঝা যাবে। চিত্র নং ১৬.৭ থেকে বুঝা যায় যে পুষ্টি সমষ্টি প্রাণী হতে অনেক দূরে অবস্থিত। চিত্রে দেখা যায় চক্র উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে এবং পুনরায় প্রানী থেকে উদ্ভিদে চলে যায়। অনেক সময় পুষ্টি সমষ্টিকে আধার সমষ্টি বলা হয়ে থাকে কারন জীব তা পায়না। কারন যে সব পদার্থ সহজেই পাওয়া যায় তাদের মধ্যে এবং যে সবপদার্থ সহজেই পাওয়া যায়না তাদের মধ্যে ধীরগতি সম্পন্ন বিদ্যমান। কার্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন চক্র এমনভাবে কাজ করে যে, কোন কারণে এ সবের পরিমানে কোন ব্যতিক্রম ঘটলে

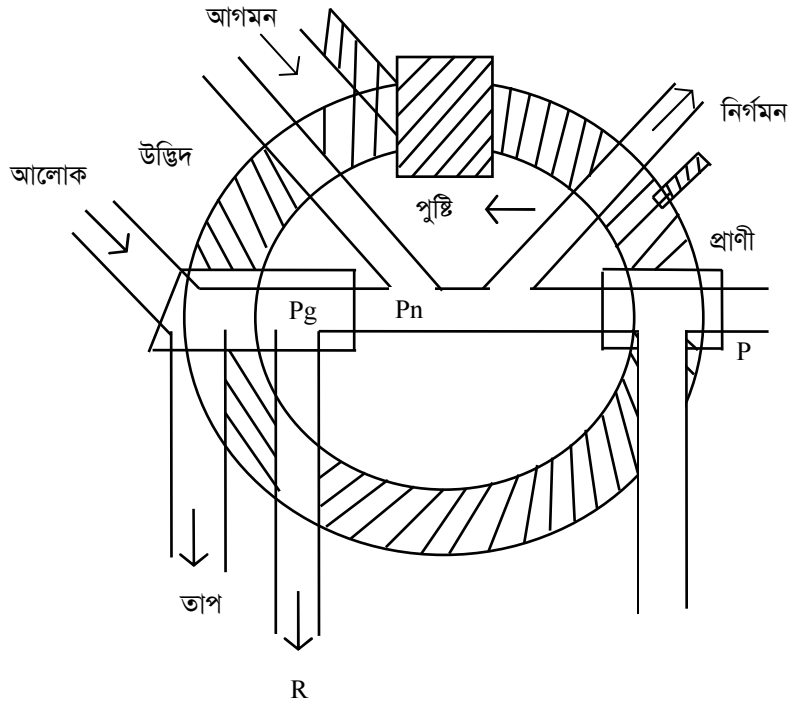

P = Productivity
Pg = Gross Productivity
Pn = Net Productivity
R = Respiration

চিত্র ১৬.৭ ঃ ভূ-রাসায়নিক চক্র

সহজেই তারা তাদের অভাব পূরন করে নিতে পারে। এটা সম্ভব হয় এজন্যে যে বায়ুমন্ডলে এসব পদার্থের অভাব নেই। কোন কারনে যদি কোন স্থানে হঠাং কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমান বৃদ্ধি পায়, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে উদ্ভিদ এমন পরিমানে তা গ্রহন করে যে অতিরিক্ত পরিমানে আর থাকেনা। অনেক সময় অতিরিক্ত কার্বনডাই অক্সাইড (CO_2) কার্বনেটে পরিনত হয় এবং তা সমুদ্রের পানির সাথে মিশে যায়। বায়বীয় পদার্থের যদি ঘাটতি দেখা দেয় তাহলে অন্যত্র হতে এ পদার্থ এসে সেখানে পৌছায় ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই ঘাটতি পূরন হয়ে যায়। এজন্য বায়বীয় ধরনের চক্রের কাজে অনেকটা পূর্নতাভাব লক্ষ্য করা যায়। সবসময় এ ধরনের ঘাটতি সহজেই পূরন হয়না বলে মানুষের জীবনযাত্রার অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

পাললিক চক্রের ক্ষেত্রে ভিন্ন অবস্থা দেখা যায়। পৃথিবী পৃষ্ঠের স্থানে স্থানে কোন বিশেষ পদার্থ বেশী পরিমানে থাকে এবং সেখানে কোন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেনা। ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনের জন্যেই এসব পদার্থ পরিমানে কম বা বেশী হয়ে থাকে। কোন কোন পদার্থ যে পরিমানে নষ্ট হয়ে যায় তা সহজে পূরন হয়না। কারন যে গতিতে এক পরিবেশ হতে অন্য পরিবেশে চলে যায়, একই গতিতে অন্য পরিবেশ থেকে ফিরে আসেনা। পদার্থের এমন ধরনের আদান প্রদানে বা আমদানী রফতানিতে যদি একটি বিশেষ নিয়ম থাকতো তাহলে অবস্থার পরিবর্তন হতো সাময়িক। মানুষ নিজের প্রয়োজনে প্রায় ৪০ ধরনের উপাদান ব্যবহার করে থাকে। মানুষ তার কাজের তাগিদে বিভিন্ন ধরনের পদার্থ অতি অল্প সময়ের মধ্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যায়। ফলে বায়োজিওকেমিকেল চক্র ভালভাবে কাজ করতে পারেনা। এ ধরনের কাজের জন্য অনেক সময় মানুষকে মাশুল দিতে হয়। কারন কোন পদার্থ একস্থানে বেশী জমা হয়, অন্যদিকে আর একস্থানে কম থাকে। উদাহরণসরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ফসফেটের খনি আছে। খনি থেকে ফসফেট তুলে আনার এবং তা দিয়ে কাজ করার ফলে আবহাওয়া স্থানীয়ভাবে দূষিত হয়ে পড়ে। অজ্ঞতার কারনে কৃষি জমিতে ফসফেট ব্যবহারের সময় চিন্তা করে দেখা হয় না যে অতিরিক্ত ফসফেট ব্যবহার করলে কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে। গবেষণা করে দেখা গেছে যে অতিরিক্ত পরিমান ফসফেট ব্যবহার করলে তার সবটুকু জমিতে ব্যবহৃত হয় না। অতিরিক্তভাবে দেওয়া

ফসফেটের বেশ কিছু অংশ পানির সাথে মিশে পানির স্বাভাবিক গুন নষ্ট করে ফেলে। পদার্থের আদান প্রদানে যেন এমন অবস্থার সৃষ্টি না হয় যে, কোন বিশেষ পদার্থের পরিমাণ কোন স্থানে অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় এবং অন্যস্থানে তা খুব কমে যায়। পানির স্বাভাবিক গুন বজায় রাখার জন্য পুষ্টির কাজে তা ব্যবহৃত হয় এমন পদার্থের পরিমান হ্রাস পেলে তা পুনরায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের মাটির সাথে ও সমুদ্রের সাথে আদান প্রদানকে ভূ-রাসায়নিক চক্র বা বায়োজিওকেমিক্যাল চক্র বলে। রাসায়নিক পদার্থ সমূহ মাটি বা পানির ধারার সাথে মিশে এবং পুনরায় মাটিতে ফিরে আসে। Biogeochemical চক্রকে দুভাগে ভাগ করা যায় যথা, বায়বীয় প্রকৃতির (gaseous type) পাললিক প্রকৃতির (Sedimentary type). বায়বীয় প্রকৃতির আধার আকাশ ও সমুদ্র এবং পাললিক চক্রের আধার পৃথিবী পৃষ্ঠের ভিতরে। পৃথিবীর প্রায় ৩০-৪০ রকমের উপাদান জীবদেহে পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়।

তন্মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন অতি প্রয়োজনীয়। ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনের জন্য পৃথিবী পৃষ্ঠের কোন কোন স্থান কোন বিশেষ পদার্থ বেশী পরিমানে পাওয়া যায়। মানুষ কাজের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরণের পদার্থ অতি অল্প সময়ে একস্থানে হতে অন্যস্থানে নিয়ে যেতে পারে। পাললিক চক্র তাই ভালভাবে কাজ করতে পারেনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬

১। বায়বীয় চক্রের আধার কোনটি?
ক. আকাশ
খ. মাটি
গ. পুকুর
ঘ. কৃষিজমি

২। পুষ্টি সমষ্টি প্রাণী হতে কোথায় অবস্থিত?
ক. অনেক দূরে
খ. অনেক নিকটে
গ. উদ্ভিদের ভেতর
ঘ. দূরেও নয় কাছেও নয়

৩। কোনটি পাললিক চক্রের পদার্থ?
ক. কার্বন ডাই অক্সাইড
খ. অক্সিজেন
গ. ফসফেট
ঘ. সালফার ডাই অক্সাইড

৪। কৃষি জমিতে অতিরিক্ত ফসফেট দিলে কি ঘটে?
ক. মাটি দূষিত হয়
খ. পানি দূষিত হয়
গ. বাতাস দূষিত হয়
ঘ. প্রাণী মারা যায়

পাঠ- ৭ ঃ কার্বন চক্র

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- কার্বন চক্র কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমান বলতে পারবেন।
- কার্বন-ডাই-অক্সাইডের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারবেন।

কার্বন চক্র

বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের অবদান অপরিসীম। বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমান ০.০৩৫% এবং তা যে চক্রের মাধ্যমে কাজ করে তা পরিবেশে খুবই গুরুত্বপূর্ন। প্রতি বছর প্রায় ৮০ কোটি টন CO_2 বাতাসে মিশে। হিসাব করে দেখা যায় যে বিভিন্ন প্রকার কলকারখানা থেকে প্রায় ৬০ কোটি টন CO_2 বাতাসে আসে। বাকী ২০ কোটি টন CO_2 আসে কৃষি জমি চাষাবাদের ফলে। এ পরিমান CO_2 এর অধিকাংশই সমুদ্রের পানিতে নেমে আসে এবং সেখানে কার্বনেট হিসাবে জমা থাকে। কৃষি জমিতে ঘন ঘন চাষ দিলে জমিতে জমাকৃত CO_2 চাষের সময় মাটি থেকে পৃথক হয়ে বাতাসের সাথে মিশে যায়। চাষের জমি হতে এভাবে CO_2 বের হয়ে যাওয়াতে এবং জমিতে অবস্থিত পচা জৈব পদার্থে অক্সিজেনের প্রক্রিয়ার ফলে পরিবেশে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। এ পরিবর্তনের ফলে পুষ্টি চক্রে পরোক্ষভাবে প্রভাব পড়ে। বনের গাছপালা কেটে ফেললে এবং উপর্যুপরি জমিতে চাষ দিলে কিছু সংখ্যক রাসায়নিক পদার্থ জমি থেকে বের হয়ে যায়। ঝিনুকের খোলস পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে ঝিনুকের খোলস বর্তমানের তুলনায় ম্যাংগানিজ ও বেরিয়াম শতকরা ৫০-১০০ ভাগ বেশী থাকত। ধারনা করা যায় যে অল্প পানির সাথে CO_2 মাটির মধ্যে প্রবেশ করার ফলে সেখানকার শিলা হতে এসব পদার্থ বের হয়ে গিয়েছে। পূর্বে পানি মাটির পচা লতা পাতার স্তর দিয়ে চুয়ায়ে যেতো। বর্তমানে পানি মাটির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় ফলে ঐ সব পদার্থ পানির সাথে চলে যায়। কৃষি জমিতে ও বনে বেশ কিছুদিন যাবৎ মানুষ যে পরিবর্তন এনেছে তার ফলেই পরিবেশে এ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। মানুষ যদি এ সমস্যা বুঝে এবং সমাধানের চেষ্টা করে (অর্থাৎ পরিমানমত রাসায়নিক সার ব্যবহার করে) তাহলে আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পারবো। পূর্বে কৃষির কাজ রাসায়নিক সার খুব ব্যবহার হতোনা। বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল শস্যের জন্য জমিতে সার ব্যবহার অপরিহার্য্য। ম্যাংগানিজ, বেরিয়াম, বোরন ইত্যাদি উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য অতি অল্প পরিমানে প্রয়োজন হয়। জমিতে এসব পদার্থের অনুপস্থিতি উৎপাদন হ্রাস করে। এমতাবস্থায় পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন কিভাবে এবং কেন বায়ুমন্ডলে CO_2 এর পরিমান হ্রাস পেয়েছে ও O_2 এর পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে; জীবমন্ডল সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবীর বায়ু মন্ডলে শুধু আগ্নেয়গিরির গ্যাস ছিল। ঐ সময় বায়ুমন্ডলে CO_2 এর পরিমান খুবই কম ছিল এবং অক্সিজেন প্রায় ছিলনা বললেই চলে। তখন যে সমস্ত জীব ছিল তাদের শ্বাস ক্রিয়া অক্সিজেন ব্যতিরেকে হতো। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে অক্সিজেনের পরিমান বৃদ্ধি পায় এবং কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমান হ্রাস পায়।

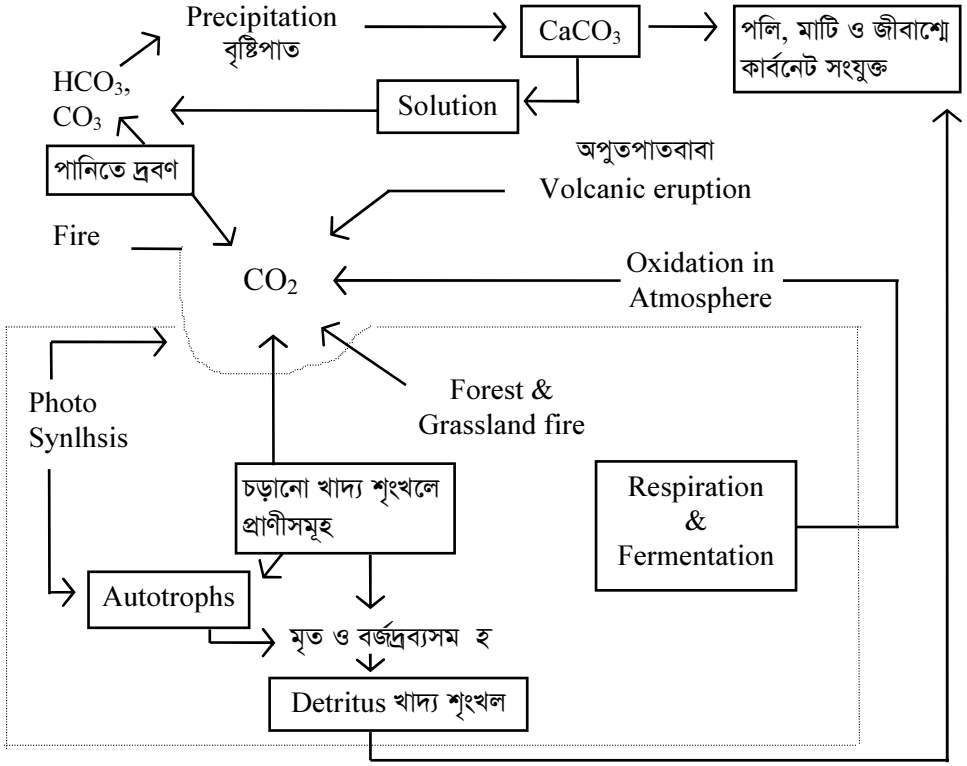

চিত্র ১৬.৮ ঃ কার্বন চক্র; ভাংগা লাইনের ভেতর জৈব ফেজ (Organic Phase)

অধিকন্তু নাইট্রোজেনের পরিবর্তনে এবং পানি হতে হাইড্রোজেনের উৎপত্তির কারণে বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের পরিমান বৃদ্ধি পায়। উদ্ভিদে সালোক সংশ্লেষনের জন্য কার্বনডাই অক্সাইডের প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর যে অংশে উদ্ভিদরাজী বেশী সেখানে প্রচুর পরিমান (CO_2) সালোকসংশ্লেষনের জন্য প্রয়োজন হয়। বর্তমানে জীবাশ্ম জালানি (fossil fuel) যেমন পেট্রোলিয়ামে, কয়লা ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে বাতাসে CO_2 এর পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। CO_2 এর পরিমান এভাবে বায়ুমন্ডলে গেলে সূর্য থেকে বিকরিত রশ্মি যেমন Infra red বা long wave radiation বেশী পরিমানে CO_2 কর্তৃক শোষিত হবে। ফলে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে উঠবে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে।

সারসংক্ষেপ

বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমান ০.০৩৫%। প্রতি বছর প্রায় ৮০ কোটী টন কার্বন ডাই অক্সাইড বাতাসে মিশে; তন্মধ্যে ৬০ কোটী টন আসে কল কারখানা থেকে। বেশীর ভাগ CO_2 সমুদ্রের পানিতে নেমে আসে। কৃষি জমিতে ঘন ঘন চাষ দিলে CO_2 মাটি হতে পৃথক হয়ে বাতাসে মিশে যায়। ফলে মানুষের কার্যকলাপের ফলে পরিবেশে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। জীবমন্ডল সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে শুধু আগ্নেয়গিরির গ্যাস ছিল এবং বায়ুমন্ডলে CO_2 এর পরিমান খুবই কম ছিল এবং O_2 ছিলনা বললেই চলে। নাইট্রোজেনের পরিবর্তনে এবং পানি হতে হাইড্রোজেনের উৎপত্তির কারণে বায়ুমন্ডলে আক্সিজেনের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭

১। কলকার খানা হতে প্রতিবছর নির্গত CO_2 এর পরিমান কত?

ক. ৫০ কোটী টন
খ. ৬০ কোটী টন
গ. ৬৫ কোটী টন
ঘ. ৭০ কোটী টন

২। কৃষি জমিতে CO_2 এর পরিবর্তনের ফলে কি ঘটে?

ক. পুষ্টি চক্রে প্রভাব পড়ে
খ. জমি অনুর্বর হয়ে যায়
গ. মাটি নষ্ট হয়ে যায়
ঘ. মাটিতে অক্সিজেনের তারতম্য হয়

৩। জীবাশ্ম জালানি ব্যবহারের ফলে বাতাসে কি বৃদ্ধি পেয়েছে?

ক. O_2 এর পরিমান
খ. CO_2 এর পরিমান
গ. N এর পরিমান
ঘ. কোন পরিবর্তন হয়নি

পাঠ- ৮ ঃ নাইট্রোজেন চক্র (Nitrogen cycle)

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- নাইট্রোজেন চক্রে ব্যাকটেরিয়ার কার্যকলাপ উল্লেখ করতে পারবেন।
- বাতাসের নইট্রোজেন গাছের মূলে এক ভাবে জমা হয়তা বলতে পারবেন।
- নীলাভ সবুজ শৈবার মাটিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

নাইট্রোজেন চক্র বায়বীয় ধরনের চক্রের একটি জটিলরূপ। কোন পরিবেশে যে পরিমান নাইট্রোজেন প্রয়োজন তা যদি না থাকে তাহলে জীবের জন্য প্রতিকুল অবস্থার সৃষ্টি হয়। জীবদেহের প্রোটোপ্লাজমে নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হয়। ইহা জৈব এবং অজৈব পদার্থ হতে পচনে সহায়তাকারী ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক প্রস্তুত হয়। নাইট্রোজেনের আংশিক অংশ সরাসরি নাইট্রেটে পরিনত হয়। উদ্ভিদ ইহা সহজে গ্রহন করতে পারে। নাইট্রোজেনের এভাবে পরিবর্তনের উদ্ভিদ কর্তৃক ব্যবহারের যে চক্র আছে তা বেশ সাধারন, চিত্র। বাতাসে শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন। বায়ুমন্ডলকে নাইট্রোজেনের আধার বলা যায়। কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন প্রস্তুত করতে পারে এবং এসব ব্যাকটেরিয়ার কার্যকলাপের ফলে সর্বদাই নাইট্রোজেন প্রস্তুত হচ্ছে, এবং বাতাসের সাথে মিশে যাচ্ছে। বাতাস হতে এই নাইট্রোজেন কিছুসংখ্যক ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সাহায্যে উদ্ভিদের মূলে এসে জমা হয়। বিদ্যুতের চমকানির সময় বাতাস হতে নাইট্রোজেন স্থলভাগে আসে। গবেষনা করে দেখা গেছে, কিভাবে নাইট্রোজেন চক্রের মাধ্যমে শক্তি এসে এ চক্রের কাজে সাহায্য করে। আমিষ জাতীয় পদার্থ থেকে নাইট্রেট গঠিত হবার সময় বিভিন্ন স্তরে যে শক্তি সঞ্চারিত হয় তা জীবের কাজে লাগে। চক্রের অন্যদিকে যে শক্তির প্রয়োজন তা আসে সূর্যের আলো বা জৈব পদার্থ থেকে। *Nitrosomonas* ব্যাকটেরিয়া অ্যামোনিয়াকে নাইট্রেটে পরিণত করে; *Nitrobacter* ব্যাকটেরিয়া নাইট্রাইটকে নাইট্রেটে পরিনত করে। কিছু সংখ্যক ব্যকটেরিয়া নাইট্রোজেনকে উদ্ভিদের মূলে জমা করে এবং এ সময় (Molybdenum) মলিবডেনাম পদার্থের প্রয়োজন হয়। এ পদার্থ খুবই অল্প পরিমানে দরকার হয় এবং পরিবেশে মলিবডেনামের অনুপস্থিতি নাইট্রোজেন জমা কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

Rhizobium ব্যাকটেরিয়া বায়ু থেকে নাইট্রোজেন নিয়ে উদ্ভিদের শিকড়ে জমা করে; এছাড়া *Azotobacter* ও *Clostridium* বায়ু থেকে N_2 নিয়ে মাটিতে জমা করে। *Nostoc* ও *Anabaena* নামক নীলাভ সবুজ শৈবাল (blue green algae) ও মাটিতে নাইট্রোজেন জমা করে থাকে। ব্যাকটেরিয়া ছাড়া অন্যান্য মাধ্যমে নাইট্রোজেন চক্র কি ভাবে কাজ করে উহা চিত্রে দেখানো হয়েছে।

গাছের পাতার উপর যে সব ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক জন্মে ইহারাও বাতাস থেকে নাইট্রোজেন নিয়ে জমা করে এবং উদ্ভিদ তা নিজের কাজে ব্যবহার করে। কি পরিমান নাইট্রোজেন জমা করা যেতে পারে তা নিয়ে গবেষনা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা ধারনা করেন জমির প্রতি বর্গমিটারে ১৪০-১৭০ মিলিগ্রাম নাইট্রোজেন জমা হয়। এই হিসাব মতে প্রতি একর জমিতে এক থেকে ছয় পাউন্ড নাইট্রোজেন জমা থাকে। সম্প্রতি গবেষনা করে দেখা গেছে যে প্রতি বর্গমিটার পরিমান জায়গায় এক গ্রাম পরিমান নাইট্রোজেন জমা হয়। সুতরাং একর প্রতি এর পরিমান হয় ১০ পাউন্ড। যে সমস্ত অঞ্চলে ভাল ফসল জন্মে সেখানে জমাকৃত নাইট্রোজেনের পরিমান প্রতি একর জমিতে প্রায় ২০০ পাউন্ড। জলাভূমিতে বিশেষ করে যেখানে নীলাভ সবুজ শৈবাল আছে অর্থাৎ যেখানকার পানি দূষিত সেখানে বেশী পরিমান নাইট্রোজেন জমা হয়। সমুদ্রে জমাকৃত নাইট্রোজেনের পরিমান অনেক বেশী। বৃষ্টির পানির সাথে নাইট্রোজেন গাছপালার উপর ও মাটির উপর পড়ে; এর পরিমান প্রতি বর্গমিটারে প্রায় ৩-৪ গ্রাম। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমান বেশী এবং নাইট্রোজেনের পরিমান প্রতি বর্গমিটারে বেশী। এর মধ্যে বেশীর ভাগই অ্যামোনিয়া এবং অন্যান্য ধরনের পদার্থ হিসাবে উড়ে যায় এবং বাতাসের সাথে মিশে যায়।

শিম জাতীয় (Legume) উদ্ভিদ যেমন, ডাল, ছিম, ধইনচা, বকফুল ইত্যাদির শিকড়ে বা মূলে নাইট্রোজেন জমা রাখে। জমির উৎপাদন ক্ষমতা ঠিক রাখার জন্য এক বছর পর পর শিম জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করা উচিৎ। এ জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ে বড় বড় দানাদার অংশে (nodule) (চিত্র) নাইট্রোজেন জমা করার পদ্ধতির কাজ করে। এ ছাড়াও লেগুম গাছসহ জমি চাষ করা হয়, লেগুম মাটির নীচে চাপা পড়ে পচে যায়। এ পদ্ধতিতে জমিতে সার বৃদ্ধিকে "সবুজ সার প্রয়োগ" বলা হয়।

জমিতে কৃত্রিম সার প্রয়োগ করলে অতিরিক্ত পরিমান নাইট্রোজেন জমি থেকে পানির সাথে অন্যত্র গিয়ে দূষণের সৃষ্টি করতে পারে। অথচ লেগুম চাষের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে যে নাইট্রোজেন জমা হয় তাতে কোন খরচ নেই এবং পরিবেশ দূষনমুক্ত থাকে। নডিউল ব্যাকটেরিয়া প্রতি একর জমিতে ৫০-১০০ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন জমা করতে পারে।

যে সবদেশে ধান চাষ করা হয়, সেখানের জমিতে নীলাভ সবুজ শৈবাল (*Nostoc*, *Anabanena*) ও ব্রায়োফাইট (Bryophyte) এজোলা (*Azolla*) জন্মে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে জমিতে এ ধরনের উদ্ভিদের উপস্থিতি ধানের

ফলন বৃদ্ধি করে। আমাদের দেশে সম্প্রতি *Azolla* চাষ নিয়ে গবেষনা চলছে। উপরের আলোচনা হতে বুঝা যায় বাতাসে যে নাইট্রোজেন আছে তা জমিতে জমা করার পদ্ধতিতে জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়।

আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে প্রচুর পরিমান নাইট্রোজেন নির্গত হয় এবং বাতাসে গিয়ে মিশে। আগ্নেয় গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে শহর ও গ্রামসহ বড় বড় জনবহুল এলাকা ধ্বংশ হয়, এজন্যে একে মানুষ অভিশাপ মনে করে। কিন্তু এতে প্রচুর পরিমান নাইট্রোজেন উপরে এসে বাতাসের সাথে মিশে যায়।

চিত্র ১৬.৯ ঃ নাইট্রোজেন চক্র

সারসংক্ষেপ

জীবদেহের প্রোটোপ্লাজমে নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদ নাইট্রেট (NO_3) সহজে গ্রহণ করতে পারে। বাতাসে নাইট্রোজেনের পরিমান শতকরা ৭৮ ভাগ। কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়ার কার্যকলাপের ফলে নাইট্রোজেন প্রস্তুত হয়ে বাতাসে মিশে যায়। আমিষ জাতীয় পদার্থ হতে নাইট্রেট গঠিত হবার সময় এবং সূর্যের আলো জৈব পদার্থ থেকে নাইট্রোজেন চক্রের শক্তি আসে। Nitrosomonas ব্যাকটেরিয়া অ্যামোনিয়াকে নাইট্রেটে (NO_3) এবং Nitrobacter নাইট্রাইটকে (NO_2) নাইট্রেটে পরিনত করে। Azotobacter, Clostridium, Rhizobium ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদের মূলে molybdenum পদার্থের উপস্থিতিতে মাটিতে নাইট্রোজেন জমা করে। এছাড়াও নীলাভ সবুজ শৈবাল (blue green algae) মাটিতে নাইট্রোজেন জমা করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন বছরে প্রতি বর্গমিটার জমিতে ১৪০-১৭০ মিলিগ্রাম নাইট্রোজেন জমা হয়। দূষিত পানিতে নীলাভ সবুজ শৈবাল জন্মে ও প্রচুর পরিমান নাইট্রোজেন জমা হয়। বৃষ্টির পানির সাথে নাইট্রোজেন স্থলভাগে আসে। Legume জাতীয় উদ্ভিদের (ডাল, ছিম, বকফুল) মূলে দানাদার (nodule) ব্যাকটেরিয়া বাতাস হতে নাইট্রোজেন নিয়ে মাটিতে জমা করে। এজন্য জমিতে একবছর পরপর লেগুম চাষ করা দরকার। কৃত্রিম সার প্রয়োগে পরিবেশ দূষিত হয়। ধান ক্ষেতে নীলাভ সবুজ শৈবাল (Nostoc, Anabaena) ও জলজ ফান Azolla বাতাস হতে নাইট্রোজেন মাটিতে জমা করে। আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে শুধু ক্ষতি হয়না বরং বাতাসে প্রচুর পরিমান নাইট্রোজেন আসে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮

১। বাতাসে নাইট্রোজেনের পরিমান কত?
ক. ৬০ ভাগ
খ. ৭০ ভাগ
গ. ৭৫ ভাগ
ঘ. ৭৮ ভাগ

২। যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদের মূলে নাইট্রোজেন জমা তাদের নাম কি?
ক. *Nostoc*
খ. *Anabaena*
গ. *Azotobacter*
ঘ. *Azotobacter* ও *Clostridium*

৩। দূষিত পানিতে নাইট্রোজেন জমা হয় কারণ
ক. *Clostridium* ব্যাকটেরিয়া আছে
খ. *Rhizobium* ব্যাকটেরিয়া আছে
গ. নীলাভ সবুজ শৈবাল আছে
ঘ. বৃষ্টির পানি জমা হয় বলে

৪। মাটিতে গাছের শিকড়ে nodule পঠন করে নাইট্রোজেন জমা করে।
ক. নীলাভ সবুজ শৈবাল
খ. আম গাছ
গ. ডাল ও সীম জাতীয গাছ
ঘ. লতানো গাছ

রচনামূলক প্রশ্ন

১. Synecology ও Autecology এর সংগা লিখুন।
২. হাইড্রোজোরির বিভিন্ন ধাপগুলো বর্ণনা করুন।
৩. বর্ণনামূলক দিক হতে ইকোসিস্টেমের উপাদানগুলো বর্ণনা করুন।
৪. ইকোসিস্টেমের প্রকৃতি আলোচনা করুন।
৫. সুন্দরবনের ইকোসিস্টেমকে লবনাক্ততার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অঞ্চলের বর্ণনা ও dominant (প্রকট) উদ্ভিদগুলির নাম লিখুন।
৬. ইকোলজিকেল পিরামিড ব্যাখ্যা করুন।
৭. বায়োজিও কেমিকেল চক্রের সংগা দিন।
৮. কার্বন চক্র ব্যাখ্যা করুন।
৯. নাইট্রোজেন চক্র আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

পাঠ- ১ ঃ ১। খ ২। গ ৩। খ ৪। গ

পাঠ- ২ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। ক ৪। খ

পাঠ- ৩ ঃ ১। খ ২। খ ৩। গ ৪। ক

পাঠ- ৪ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। গ

পাঠ- ৫ ঃ ১। খ ২। খ ৩। খ

পাঠ- ৬ ঃ ১। ক ২। ক ৩। গ ৪। খ

পাঠ- ৭ ঃ ১। খ ২। ক ৩। খ ৪। খ ৫। গ

পাঠ- ৮ ঃ ১। ঘ ২। ঘ ৩। গ ৪। গ